যুগান্তর

তারিখ ... 18 AUG 2015 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# ফলাফলে বৈষম্য শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতারই প্রকাশ

মো. খাইরুল ইসলাম

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বা ইতিবাচক দিক আছে অনেক। ২০১০ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন, ২০১২ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং সেই অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা, বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনা, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ছাত্রীদের পাসের হার বৃদ্ধি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সৃজনশীল পদ্ধতির প্রয়োগ, শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, ছাত্রী উপবৃত্তি— সবই উল্লেখ করার মতো সফলতা বা অগ্রগতি। কিন্তু ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আবার প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতাকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা গেলেও শিক্ষাব্যবস্থার নানা দুর্বলতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, রাজশাহী বোর্ডে ৭৭.৫৪, সিলেট বোর্ডে ৭৪.৫৭, দিনাজপুর বোর্ডে ৭০.৪৩, বরিশাল বোর্ডে ৭০.০৬, ঢাকা বোর্ডে ৬৮.১৬, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬৩.৪৯, কুমিল্লা বোর্ডে ৫৯.০৮ এবং যশোর বোর্ডে ৪৬.৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অন্য বছরের তুলনায় ফলাফল খারাপ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তকরণ, মূল্যায়নে সৃজনশীল প্রশ্নের ব্যবহার, কোনো কোনো বোর্ডে ইংরেজি প্রশ্ন কঠিন হওয়া এবং বিশেষ করে যশোর বোর্ডের ফল বিপর্যয়কে দায়ী করা হচ্ছে। এ কারণগুলোর হয়তো যৌক্তিকতা আছে; কিন্তু প্রশ্ন হল, এ বিষয়গুলো নিয়ে আগে থেকে কেন পদক্ষেপ নেয়া হল না? রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, যা ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। কিন্তু অন্য বিষয়গুলো বিবেচনা করে কেন আগে থেকে পদক্ষেপ নেয়া হল না? পরিপূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে আমরা কেন আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর নতুন নতুন বিষয় ও পদ্ধতি চাপিয়ে দিচ্ছি? বিষয়গুলো বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিলে ফল বিপর্যয় অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যেত বলে আমার বিশ্বাস।

সামগ্রিক ফল বিপর্যয়ের আরেকটি বড় কারণ হল যশোর বোর্ডের পাসের হার (৪৬.৪৫), যা সার্বিক ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলেছে। প্রশ্ন হল, যশোর বোর্ডের ফলাফল অন্য বোর্ডের তুলনায় এত খারাপ হল কেন? যশোর বোর্ডের শিক্ষার্থীরা কি মেধাবী নয়? এরা কি পড়াশোনা করেনি? শিক্ষকরা কি ঠিকমতো ক্লাসে পড়াননি? নাকি পরীক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি এজন্য দায়ী? রাজনৈতিক অস্থিরতা যদি ফল বিপর্যয়ের জন্য দায়ী হয়, তাহলে রাজশাহী বোর্ডে (পাসের হার ৭৭.৫৪ শতাংশ) কি এর প্রভাব পড়েনি কিংবা যশোর বোর্ডে (পাসের হার ৪৬.৪৫ শতাংশ) কি বেশি প্রভাব পড়েছে? অন্য সব বোর্ডের ফলাফল যশোর বোর্ডের তুলনায় অনেক ভালো। এরই বা কারণ কী? মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল বরাবরের মতো এবারও তুলনামূলক ভালো। তাহলে কি মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার মান সাধারণ শিক্ষার চেয়ে এগিয়ে? বৈষম্যমূলক এই ফলাফল নিয়ে আমাদের এখনই ভাবতে হবে।

নানা কারণে সামগ্রিক ফলাফল বিপর্যয় মেনে নেয়া গেলেও একই দেশের, একই পাবলিক পরীক্ষায় বিভিন্ন বোর্ডের ফলাফলে এত বৈষম্য মেনে নেয়া যায় না। একটি শিক্ষা বোর্ডের অর্ধেকেরও বেশি (৫৩.৫৫) শিক্ষার্থী ফেল করবে এটা কোনোভাবেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থারই দুর্বলতা। এই বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে এখনই। তা না হলে সামনে আরও খারাপ পরিণতি হতে পারে।

যেসব শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করল, কিছুদিন পর তারা বিভিন্ন ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। উচ্চশিক্ষার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর এইচএসসির ফলাফলকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যশোর বোর্ডের শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার শুরুতেই পিছিয়ে পড়বে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সুযোগই পাবে না। কারণ জিপিএ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এই বোর্ডের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে। শিক্ষার্থীদের এই অপূরণীয় ক্ষতির দায় কে নেবে? যেসব শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রশ্ন প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত, তারা কি একবারও আমাদের শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেছেন? নাকি সিলেবাস ধরে প্রশ্ন করে শুধু দায়িত্ব পালন করেছেন?

নানা কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও কেন্দ্রীভূত। সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, একই দেশের একই পাবলিক পরীক্ষায় কেন ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হবে? সারা দেশে একই প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার অসুবিধা কোথায়? সেক্ষেত্রে আর যাই হোক কোনো একটি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা এতটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে না।

শিক্ষা বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা সাধারণ তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করি। এক. শিখনের জন্য মূল্যায়ন; দুই. শিখনের মূল্যায়ন; তিন. শিখন হিসেবে মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীদের ফেল করানোর উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের কথা শিক্ষা বিজ্ঞানের কোথাও উল্লেখ নেই। অথচ যশোর বোর্ডের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের ফেল করানোর উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্ন করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের ফেল করানোর জন্য। তা না হলে ৫৩.৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ফেল করতে পারে না। তাদের প্রত্যেকেই কিন্তু সফলতার সঙ্গে দু'বছর আগে এসএসসি পাস করেছে। দু'বছরের ব্যবধানে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থীর এভাবে ঝরে পড়া অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত। অনেকটা অযৌক্তিকও বটে। দু'বছর ধরে এই শিক্ষার্থীরা কি পড়াশোনা করেনি? দু'বছর আগে কি এদের গণহারে পাস করানো হয়েছে? নাকি মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে এরা ঝরে পড়েছে? অনেক প্রশ্ন সামনে চলে আসে। আর যাই হোক, শিক্ষার্থীদের গড়পড়তায় দায়ী করা চলে না। মূল্যায়ন ব্যবস্থা তথা শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিই এক্ষেত্রে প্রধান কারণ। শোনা যাচ্ছে, ইংরেজি পরীক্ষা কঠিন হওয়ার কারণে যশোর বোর্ডের ফলাফল এত খারাপ। কিন্তু প্রশ্ন হল, ইংরেজি পরীক্ষা এত কঠিন হল কেন? এটা কি শিক্ষার্থীদের ফেল করানোর আয়োজন নয়?

যে কোনো পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণয়ন করা হয়। যেমন— বিভিন্ন শিক্ষক কর্তৃক প্রশ্ন প্রণয়ন, বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মডারেশন, প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি। যেসব শিক্ষক এত কঠিন প্রশ্ন করলেন তাদেরই বা উদ্দেশ্য কী? বিজ্ঞ মডারেশন কমিটি এখানে কী ভূমিকা পালন করল? এত কঠিন প্রশ্ন কেনই বা চূড়ান্ত হল? প্রতিটি প্রশ্ন একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রণয়ন করার কথা, যেখানে ৫০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ার সুযোগ থাকে না। তাহলে কেনই বা মানদণ্ড অনুসরণ করা হল না? এর ফলাফল যে কত নির্মম তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। কত ছেলেমেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, কত বাবা-মায়ের স্বপ্ন ফিকে হয়ে গেছে, তার হিসাব হয়তো কখনও জানা যাবে না। তবে এই পরিস্থিতির দায় কাউকে না কাউকে নিতে হবে।

পরীক্ষা চলাকালীন যশোর বোর্ডের বেশ কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাদের সবার মুখে একই কথা : ইংরেজি প্রশ্ন এত কঠিন হয়েছে যে, শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়েছে। ফলাফল প্রকাশের পর তাদের সঙ্গে আবার কথা হল। যেন মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না মানুষগুলোর। স্বপ্ন যে ভেঙে চুরমার। এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী এবার পেয়েছে এ মাইনাস। ইংরেজিতে পেয়েছে ডি। আরেকজন গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী এবার পেয়েছে এ মাইনাস। ইংরেজিতে পেয়েছে সি। সুতরাং ইংরেজি প্রশ্ন যে বেশি কঠিন হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এসব শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কী? এরা কি অন্য বোর্ডের অসংখ্য জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে? যতই পরিশ্রম করে এখন পড়াশোনা করুক না কেন, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজির শর্তপূরণ করা বাধ্যতামূলক সেখানে তারা কী করবে? ফলাফলের এ বৈষম্য এবং শিক্ষার্থীদের এভাবে বিপদে ফেলার জন্য কি আমরাই দায়ী নই? বিষয়টি এখনই ভাবতে হবে।

বাংলা, ইংরেজি পরীক্ষাগুলো সাধারণত প্রথমদিকে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকের পরীক্ষা চরম খারাপ হলে এর প্রভাব বাকি পরীক্ষাতেও পড়ে। মানসিক চাপ থেকে শিক্ষার্থীরা আর সহজে বের হয়ে আসতে পারে না। প্রশ্ন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারলে এমন পরিস্থিতি অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব হতো। কিন্তু তারা সেটি না করে যে প্রশ্ন কঠিন করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, সেটা পরীক্ষার ফলাফল দেখলেই বোঝা যায়।

প্রকৃতপক্ষে কঠিন প্রশ্ন করার মাঝে কোনো কৃতিত্ব নেই, যেটা মানসম্মত প্রশ্ন করার মাঝে আছে। একই দেশের একই পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফলের এত বড় ধরনের বৈষম্য মেনে নেয়া যায় না। এক্ষেত্রে ভালো ফলাফল করা বোর্ডগুলোকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। তবে খারাপ ফলাফল করা বোর্ডগুলোর দুর্বলতা অস্বীকার করার উপায় নেই, যা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থারই দুর্বলতা। এতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষক সমাজ থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে।

**মো: খাইরুল ইসলাম :** *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

khairul_iers@yahoo.com